স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

যতদিন বাঁচবো, যক্ষ্মাকে রুখবো

ডাঃ মোঃ তৌফিক রহমান, আইসিডিডিআর,বি

যক্ষ্মা বা tuberculosis (TB) সবার কাছেই অতি পরিচিত একটি রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯৩ সালে যক্ষ্মা রোগকে সারাবিশ্বের জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে যক্ষ্মার জন্য উচ্চমানের কার্যকর চিকিৎসা-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এখনও এই রোগ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ২০১১ সালে সারাবিশ্বে আনুমানিক ৯০ লক্ষ যক্ষ্মা রোগী সনাক্ত করা হয় এবং এদের মধ্যে ১৪ লক্ষ মারা যায়। বিশ্বব্যাপী সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে মৃত্যুর কারণ হিসেবে যক্ষ্মার অবস্থান দ্বিতীয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং এদের মধ্যে প্রায় ৬৮,০০০ জন মারা যায়। বাংলাদেশে যক্ষ্মার চিকিৎসার সাফল্যের হার সন্তোষজনক হলেও রোগনির্ণয়ের হার আশাব্যঞ্জক নয়। সামাজিক অসচেতনতা এবং যক্ষ্মাসম্পর্কিত সঠিক তথ্যের অভাব যক্ষ্মা নির্ণয়ের হার বৃদ্ধিতে বড় রকমের বাধা হিসেবে কাজ করে। যেসব রোগীর তিন সপ্তাহের বেশি সময়ব্যাপী কাশি আছে তাদের বেশিরভাগই ডাক্তারী পরামর্শ ও সময়মত কফ পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান না, যার ফলে এসব ব্যক্তির দ্বারা যক্ষ্মা রোগের জীবাণু অন্যের দেহে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়। যক্ষ্মা নিরাময়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও পূর্ণমেয়াদে চিকিৎসা সম্পন্ন করা যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের একটি অপরিহার্য শর্ত। যক্ষ্মার ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রে প্যারামেডিক, কাউন্সেলর, স্বাস্থ্যসহকারী, স্বাস্থ্যকর্মী বা গ্রাম-ডাক্তারদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

যক্ষ্মা কী

যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ যা *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস* নামের জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়। সংক্রমণের স্থান অনুযায়ী যক্ষ্মা রোগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

ক. ফুসফুসের যক্ষ্মা (Pulmonary TB)

খ. ফুসফুস-বহির্ভূত যক্ষ্মা (Extrapulmonary TB)

যক্ষ্মার লক্ষণসমূহ

- ২-৩ সপ্তাহ অথবা তার থেকে বেশি সময় ধরে কাশি
- কফের সাথে রক্ত-আসা
- বুকে ব্যথা
- প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা রাতে জ্বর-আসা
- অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ-করা
- ওজন কমে-যাওয়া

চিকিৎসাধীন একজন যক্ষ্মা রোগী

ভেতরের পাতায়

- জলবসন্ত সম্পর্কে জানুন
- শিশুদের জন্য সম্পূরক খাবার
- প্রত্যেক রক্তদাতা একজন বীর

বর্ষ ২১ | সংখ্যা ৩

চৈত্র ১৪১৯ | এপ্রিল ২০১৩

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আব্বাস ভূঁইয়া
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

রুখসানা গাজী, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, রুবহানা রকিব ও মাখদুম আহমেদ

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮৪০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

- ক্ষুধা কমে-যাওয়া
- রাতে ঘাম-হওয়া

উল্লেখ্য, ফুসফুস-বহির্ভূত যক্ষ্মা হলে আক্রান্ত স্থানের প্রকারভেদে অন্যান্য লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

যক্ষ্মার জীবাণু কীভাবে ছড়ায়

ফুসফুসের যক্ষ্মা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত রোগী যক্ষ্মার জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। একজন যক্ষ্মার রোগী (যে চিকিৎসা গ্রহণ করে নি) বছরে প্রায় ১০-১৫ জন ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারে। এভাবে সে তার পরিবারের সদস্য ও আশপাশের লোকজনের মধ্যে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়াতে পারে। নিম্নোক্ত উপায়ে যক্ষ্মা ছড়াতে পারে:

- কাশির মাধ্যমে
- হাঁচির মাধ্যমে

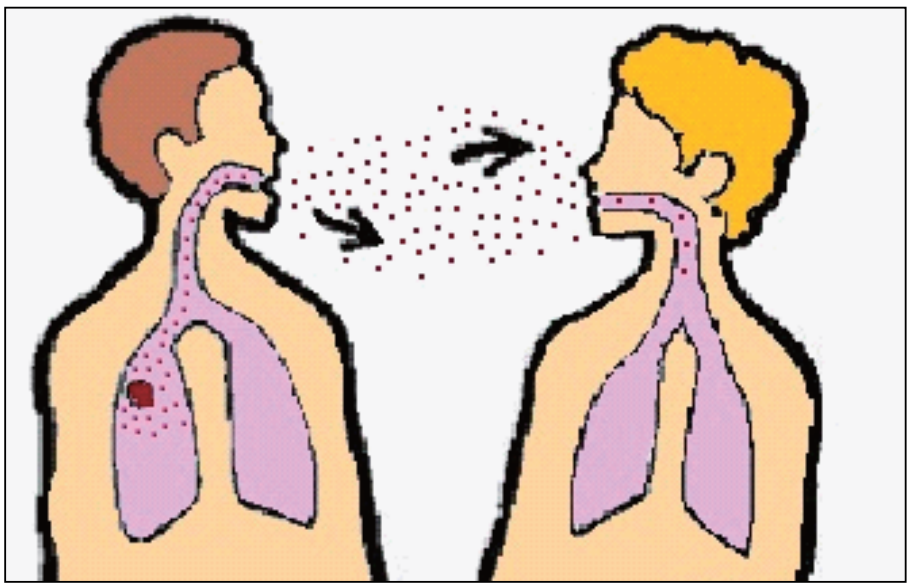

- চিৎকারের মাধ্যমে
- জোরে হাসাহাসির মাধ্যমে

নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশের পর এই জীবাণু নিজ শক্তিতেই ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এলভিওলি নামের ক্ষুদ্র বায়ুথলিতে অবস্থান নেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বসবাস, কাজ বা খেলাধুলা করতে গিয়ে একই বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করলে যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কীভাবে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ায় না

- হাত মেলানোর মতো সাধারণ স্পর্শের মাধ্যমে
- আক্রান্ত রোগীর খাবার খাওয়া অথবা পাত্র বা পানির গ্লাস ব্যবহারের মাধ্যমে
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিগারেট খাওয়ার মাধ্যমে
- মুখের লালা অথবা দেহ থেকে নির্গত অন্য কোনো জলীয় পদার্থের মাধ্যমে
- পাবলিক টেলিফোনের মতো অনেকের ব্যবহৃত কোনো বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমে

যক্ষ্মার জীবাণুর সংক্রমণ বনাম যক্ষ্মা রোগ

যক্ষ্মা রোগের জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হওয়া এবং যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

যক্ষ্মার জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ: এ-অবস্থায় যক্ষ্মার জীবাণু ফুসফুসে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবে সংক্রামিত ব্যক্তিকে অসুস্থ করতে পারে না এবং তার কাছ থেকে অন্যদের মধ্যেও ছড়ায় না।

যক্ষ্মা রোগ: এ-অবস্থায় যক্ষ্মার জীবাণু ফুসফুসে সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং সংক্রামিত ব্যক্তিকে অসুস্থ করতে পারে। এই জীবাণু সংক্রামিত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়ায়।

যক্ষ্মা রোগ সনাক্তকরণ পদ্ধতি

- কফ পরীক্ষা
- বুকের এক্স-রে
- এমটি টেস্ট
- কফ কালচার
- নতুন আবিষ্কৃত দ্রুত সনাক্তকরণ পরীক্ষা, যেমন GeneXpert

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা

- যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় ওষুধের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করা হয়
- চিকিৎসা সাধারণত ৬-৯ মাস মেয়াদী হয়ে থাকে
- সঠিক চিকিৎসায় যক্ষ্মা সম্পূর্ণ ভালো হতে পারে

প্রতিটি উপজেলা হাসপাতাল, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক এবং নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিকে বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগের

পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়। নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে যক্ষ্মার রোগী সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যায়। অনিয়মিত, অপর্যাপ্ত, এবং অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় যক্ষ্মা জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা করা হলেও রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

যক্ষ্মার ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

যক্ষ্মার ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্য রোগী ওষুধ সেবন বন্ধ করে দিতে পারে। ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণে উৎসাহিত না-ও হতে পারে এবং চিকিৎসায় উদাসীনতা দেখাতে পারে, যার ফলে রোগীর শারীরিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুরুতর কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না এবং কোনো বাড়তি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এসব ক্ষেত্রে রোগীকে একটু বুঝিয়ে-শুনিয়ে আশ্বস্ত করা উচিত। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া গুরুতর আকার ধারণ করলে সাথেসাথে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দিতে হবে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিচে ছকের সাহায্যে যক্ষ্মার ওষুধের সম্ভাব্য কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া	ব্যবস্থাপনা
গুরুতর নয়	
১. বমি-বমি ভাব	রোগীকে বোঝাতে হবে যে, এতে কোনো ক্ষতি হবে না। তাকে নিয়মিত ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিতে হবে
২. কমলা বা লাল রঙের প্রস্রাব	রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, এতে ক্ষতি নেই এবং তাকে নিয়মিত ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিতে হবে
৩. গিরায় ব্যাথা	রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে এবং প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিতে হবে
গুরুতর	
• মাথা-ঘোরা • কানে ঝিনঝিন শব্দ হওয়া • পায়ে জ্বালা অনুভব-করা • চামড়ায় ফোসকা পড়া, চুলকানি-হওয়া • অবিরত বমি-হওয়া • চোখে ঝাপসা দেখা • চামড়া এবং চোখে হলুদ রং ধারণ-করা	এসব ক্ষেত্রে দেরি না করে জরুরিভিত্তিতে রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাতে হবে

DOTS বলতে কী বোঝায়

DOTS যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি চিকিৎসা-কৌশল যার মাধ্যমে রোগী প্রতিদিন প্যারামেডিক, কাউন্সেলর, স্বাস্থ্যসহকারী, স্বাস্থ্যকর্মী বা গ্রাম-ডাক্তারের পর্যবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে যক্ষ্মার চিকিৎসার পূর্ণমেয়াদের ওষুধ সেবন করবে।

D=Directly (সরাসরি)—এখানে সামনাসামনি উপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে

O=Observed (পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে)—কারো উপস্থিতিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

T=Treatment (চিকিৎসা)—কারো উপস্থিতিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যক্ষ্মার চিকিৎসা

S=Short course (স্বল্পমেয়াদ)—কারো উপস্থিতিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যক্ষ্মার চিকিৎসার স্বল্পমেয়াদ হয়ে থাকে, যা অন্তত ২০ থেকে ২৪ মাস সেবন করতে হয়।

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ

যেহেতু যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ তাই এর প্রতিরোধ-ব্যবস্থা জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংশ। এ-রোগ প্রতিরোধে যেসব পদক্ষেপ অনুসরণযোগ্য সেগুলো হলো:

- রোগের সম্ভাব্য লক্ষণ প্রকাশ পেলে প্যারামেডিক, কাউন্সেলর, স্বাস্থ্যসহকারী, স্বাস্থ্যকর্মী বা গ্রাম-ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া।
- রোগ সনাক্ত হলে অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা এবং নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগতভাবে ও পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবন করা।
- অপরের মধ্যে সংক্রমণ এড়াতে রোগীর কফ ও থুথু নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা এবং পরে তা মাটিতে পুঁতে-ফেলা বা পুড়িয়ে-ফেলা।

নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে যক্ষ্মা সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যায়

যেসব রোগীর বাড়ি দূরে অবস্থিত এবং প্রতিদিন ক্লিনিকে আসা সম্ভব নয়, তাদের ক্ষেত্রে রোগীর সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে DOTS প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, স্থানীয় স্বাস্থ্যসহকারী বা স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়িতে কিংবা গ্রাম-ডাক্তারের বাড়ি বা চেম্বারে এসে ওষুধ সেবন করা যেতে পারে।

ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা (MDR-TB) কী

যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর Isoniazide এবং Rifampicin যদি কাজ না-করে তখন তাকে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা বলা হয়। ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে নির্ধারিত যক্ষ্মার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে বিকল্প ওষুধ দেওয়া

কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ বোধ করলে অনেক রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এরকম প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ অনিয়মিত চিকিৎসার ফলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে যায় বা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে ঐ রোগীর জন্য যক্ষ্মা অনিরাময়যোগ্য হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। এমন অবস্থায় রোগীর নিজের ভোগান্তির পাশাপাশি সে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এবং আশপাশের লোকজনের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই, নিয়মিত, সঠিক মাত্রায় ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চিকিৎসার অপরিহার্যতার কথা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে। ■

জলবসন্ত সম্পর্কে জানুন

ডাঃ মোঃ মোশতাক পারভেজ, আইসিডিডিআর,বি

জলবসন্ত বা chicken pox একটি সাধারণ গ্রীষ্মকালীন অসুখ। জলবসন্তের ফলে রোগীর সারা শরীরে ছোটছোট লাল দানার মতো ফুসকুড়ি দেখা দেয়। সাধারণত অল্পবয়সে এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। যত বেশি বয়সে এ-রোগ হয় রোগের তীব্রতাও তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে, প্রতিষেধক এবং উন্নত চিকিৎসা-ব্যবস্থার কল্যাণে এ-রোগের জটিলতা বর্তমানে বেশ কমে এসেছে। প্রতিষেধক ব্যবস্থা না-নেওয়া থাকলে প্রায় সবার জীবনেই একবার জলবসন্ত হতে পারে। তবে, একবার এ-রোগ হওয়ার পর শরীরে বিশেষ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। ফলে, দ্বিতীয়বার এ-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। গর্ভবতী মহিলা, নবজাতক শিশু, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন ব্যক্তি অথবা বিশেষ কোনো চিকিৎসার স্বার্থে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে এমন রোগীদের জন্য জলবসন্ত কষ্টদায়ক হতে পারে, যদিও এ-রোগ স্বাস্থ্যের খুব বেশি ক্ষতি করে না। কিছুকিছু ক্ষেত্রে অল্পমাত্রায় জলবসন্ত হয়ে সেরে যাওয়ার পরও এ-রোগের ভাইরাস শরীরে থেকে গেলে পরবর্তীকালে তীব্রমাত্রায় এ-রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এবং শিঙ্গেলস বা হার্পিস জোস্টার-নামক ত্বকের একধরনের রোগ দেখা দিতে পারে, যা খুবই কষ্টকর ও দীর্ঘমেয়াদী।

জলবসন্তের কারণ এবং বিস্তার

ভেরিসেলা জোস্টার নামের একধরনের ভাইরাসের কারণে জলবসন্ত হয়ে থাকে। এই ভাইরাস মাত্র ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই শরীরে ছড়িয়ে যায়। কোনো উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেও জলবসন্ত ব্যক্তির দেহে ছড়িয়ে যেতে পারে। এটি সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। যাদের আগে কখনো এই অসুখ হয় নি এবং যারা প্রতিষেধক নেন নি তাদের জলবসন্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। সাধারণত দেখা যায়, একটি পরিবারের একজনের মধ্যে এ-রোগ শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সদস্যদেরকেও আক্রান্ত করে। জলবসন্ত হয়েছে এমন কারো সঙ্গে বদ্ধ ঘরে অবস্থান করলে এ-রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

জলবসন্তের প্রধান উপসর্গ ও লক্ষণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- ১০০-১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট জ্বর
- খুব অসুস্থ ও ক্লান্ত বোধ-করা
- ক্ষুধামন্দা
- মাথাব্যথা এবং গলা শুকিয়ে-যাওয়া
- শরীরজুড়ে ছোটছোট লাল দানা-ওঠা এবং দানাগুলো থেকে পানির মতো কষ বের-হওয়া
- অনেকটা ব্রনের মতো বড়বড় ফুসকুড়ি দেখা-দেওয়া।

অনেকসময় শিশুদের এধরনের উপসর্গ ছাড়াও জলবসন্ত হতে পারে এবং ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ১৪-১৬ দিন পরও উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই সময়কে ইনকিউবেশন পিরিয়ড (সুপ্তিকাল) বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে ১০ দিনের মধ্যে সবকিছু ভালো হয়ে যায়।

জলবসন্তের কারণে সৃষ্ট জটিলতা

জলবসন্তের একটি সাধারণ জটিলতা হলো ত্বকের প্রদাহ, যা কখনও কখনও বেশ জটিল রূপ ধারণ করতে পারে। অন্যান্য যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো:

- ভ্যারিসেলা নিউমোনিয়া—জলবসন্তের ভাইরাস ফুসফুসে আক্রমণ করলে এ-সমস্যা হতে পারে। সাধারণত কমবয়সী শিশুদের, গর্ভাবস্থার শেষের দিকে মহিলাদের, ধুমপানকারী ব্যক্তিদের এবং দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এ-রোগ হতে পারে।
- এনসেফ্যালাইটিস—এটি মানুষের মস্তিষ্কের একটি রোগ। জলবসন্তের লাল দানা হওয়ার ৫-১০ দিনের মধ্যে এ-রোগ হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশে হয়ে থাকে কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এটি মস্তিষ্কের একটি বড় অংশজুড়ে হতে পারে এবং বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এর বেশকিছু সাধারণ উপসর্গ রয়েছে, যেমন প্রচণ্ড জ্বর, ভীষণ মাথাব্যথা, ঘুম-ঘুম ভাব, আলোর প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা অর্থাৎ আলো দেখলে খুব খারাপ-লাগা এবং বমি-বমি ভাব। এ-রোগের ফলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, এমনকি অস্ত্রোপচারও লাগতে পারে। উপসর্গ দেখা দিলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।
- চোখের সমস্যা—চোখের কর্নিয়াতে জলবসন্ত হলে দেখতে সাময়িকভাবে অসুবিধা হতে পারে। চোখে বসন্তের মাত্রা বেশি হলে স্থায়ীভাবে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

জলবসন্তের ফলে রোগীর শরীরে এরকম ফুসকুড়ি দেখা দেয়

- রেই'স সিনড্রোম—২০ বছরের কমবয়সী কোনো জলবসন্তের রোগী অ্যাসপিরিন সেবন করলে এ-সমস্যা হতে পারে।

গর্ভকালীন সময়ে জলবসন্তের জটিলতা

কোনো গর্ভবতী মহিলার জলবসন্ত হলে তিনি বেশ ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। শিশুর জন্মদানের সময় নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে বা তিনি অপরিপক্ক শিশুর জন্ম দিতে পারেন। গর্ভবতী মায়ের জলবসন্ত হলে তার ভ্যারিসেলা নিউমোনিয়া হতে পারে। মায়ের জলবসন্ত নবজাতক শিশুর জন্যও বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে কারণ তার মধ্যে জন্মগত কোনো ত্রুটি দেখা দিতে পারে অথবা জন্মের পরে কোনো সমস্যা হতে পারে। সন্তান প্রসবের কিছুদিন আগে মায়ের জলবসন্ত হলে নবজাতক শিশুরও এ-রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা

স্বাস্থ্যবান শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শুধুমাত্র বাড়িতে বসেই চিকিৎসা করা সম্ভব। বাসার চিকিৎসা মানে বিশ্রাম নেওয়া এবং জ্বর ও জ্বালাপোড়ার জন্য ওষুধ খাওয়া। যাদের অনেক বেশিমাত্রায়, দীর্ঘসময়ের জন্য এ-রোগ হয় তাদের জন্য এসাইক্লোভির-এর মতো অ্যান্টিভাইরাস ওষুধের দরকার হয়।

- জ্বর এবং ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল এবং আইবুপ্রোফেন ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- যাদের বয়স ২০ বছরের বেশি তাদের জন্য অ্যাসপিরিন দেওয়া যেতে পারে। যাদের বয়স ২০ বছরের কম তাদেরকে অ্যাসপিরিন দেওয়া উচিত নয়, এতে ভ্যারিসেলা নিউমোনিয়া-নামক একধরনের জটিল রোগ দেখা দিতে পারে।
- জলবসন্তের কারণে রোগীর শরীরের চুলকানি কমাতে অ্যান্টিহিস্টামিন দেওয়া যেতে পারে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া আবশ্যক

- প্রচণ্ড মাথাব্যথা হলে
- ক্রমাগত বমি হলে
- নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলে অথবা ক্রমাগত কাশি হলে
- চামড়ার মধ্যে লাল ফুসকুড়ি হলে অথবা ফুসকুড়িগুলো খুব বড় আকার ধারণ করলে
- দু'দিন ধরে ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি জ্বর থাকলে
- চোখের কর্নিয়ার ভেতরে বসন্ত হলে
- ২ সপ্তাহের বেশি সময় ফসকুড়ি থাকলে

কীভাবে ত্বকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়

অনেকসময় জলবসন্তে ত্বকের বেশ ক্ষতি হতে পারে, যেমন দীর্ঘস্থায়ী দাগ বসে যেতে পারে বা একটু বড় আকারের বসন্তের স্থানে গর্ত হয়ে যেতে পারে। জলবসন্তের রোগীর ত্বকের সংক্রমণ ও প্রদাহ যেন বেশি ছড়িয়ে পড়তে না-পারে সেজন্য তার দেহের ফুসকুড়িগুলোতে যতটা সম্ভব কম চুলকানো উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে:

- নখ খুব সাবধানে ছোট করে কেটে দিতে হবে এবং সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে
- হাত ও সারা শরীর ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে
- পরিষ্কার সুতির কাপড় ও মোজা পরাতে হবে।

ত্বকের জ্বালাপোড়া ভাব দূর করতে করণীয়

- রোগীকে ঢিলেঢালা সুতির জামাকাপড় পরাতে হবে

একটি শিশুকে জলবসন্তের টিকা দেওয়া হচ্ছে

- উন্নতমানের গুঁড়ো সাবান বা কাপড় কাচার সাবানের সাহায্যে রোগীর জামাকাপড় এবং বিছানা প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করতে হবে
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সাবান ব্যবহার করতে হবে
- ক্রিম অথবা লোশন ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন কারণ সবধরনের ওষুধ সবার জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

জলবসন্তের বিস্তার রোধে করণীয়

আপনার বা আপনার শিশুর জলবসন্ত হলে সম্পূর্ণভাবে ভালো না-হওয়া পর্যন্ত আপনি কাজে যাবেন না এবং আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠাবেন না। যাদের আগে বসন্ত হয় নি তাদেরকে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। রোগীর সাথে একই ঘরে বসবাসকারী ব্যক্তি খুব সহজেই আক্রান্ত হতে পারে এবং রোগীর সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করলে এ-রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। কখনও জলবসন্ত হয় নি এমন গর্ভবতী মহিলাকে অবশ্যই আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং তাকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

রোগীর দেহের ফুসকুড়ি ফেটে গিয়ে কষ বের হলে নরম পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সাবধানে সেই জায়গা মুছে দিতে হবে এবং পরনের কাপড় অবশ্যই পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে হবে। ফুসকুড়ি শুকিয়ে গেলে যে শক্ত অংশটুকু ঝরে পড়ে তা নির্দিষ্ট স্থানে জমিয়ে পুড়িয়ে ফেলা দরকার, যেন তা থেকে রোগের বিস্তার ঘটতে না-পারে।

কীভাবে জলবসন্ত প্রতিরোধ করা যায়

টিকার সাহায্যে জলবসন্ত প্রতিরোধ করা যায়। শিশুদের বয়স একবছর পূর্ণ হলেই এই টিকা দেওয়া যায় এবং যেকোনো পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এই টিকা নিতে পারেন। দুটি ডোজে এই টিকা দেওয়া হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৫ মাস বয়সের মধ্যে প্রথম ডোজ এবং ৪ থেকে ৬ বছর বয়সের মধ্যে দ্বিতীয় ডোজটি দেওয়া হয়ে থাকে। বড়দের ক্ষেত্রে সাধারণত ৪ থেকে ৮ সপ্তাহের ব্যবধান রেখে দু'টি ডোজ দেওয়া হয়ে থাকে। যাদের কখনও জলবসন্ত হয় নি তারা প্রতিষেধক টিকা নিলে এ-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। অনেক বাবা-মা মনে করেন, ছোটবেলায় জলবসন্ত হওয়া ভালো, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। জলবসন্ত থেকে অনেকসময় বড় ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই আগে থেকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ভালো। ■

শিশুদের জন্য সম্পূরক খাবার

আনোয়ারা হায়দার, আইসিডিডিআর,বি

শিশুর জীবন রক্ষা করতে ও তার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মায়ের দুধই আদর্শ খাদ্য। শিশুকে জন্মের পর শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ালে তা তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে তার মধ্যে ডায়রিয়া, নিম্ন-শ্বাসনালীর সংক্রমণ, কান-পাকা, মস্তিষ্কঝিল্লির ব্যাকটেরিয়াজনিত প্রদাহ প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা ও তীব্রতা হ্রাস পায়। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতে, শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে, এমনকি পানি খাওয়ানোরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু ছয়মাস বয়সের পর শিশুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি শুধুমাত্র মায়ের দুধ থেকে পাওয়া যায় না। তখন থেকে শিশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য তাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি একটু বাড়তি খাবার দিতে হয়। ৬ মাস বয়সের পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে যে বাড়তি খাবার দেওয়া হয় তাকেই সম্পূরক খাবার বলে। একজন মা দৈনিক কতটুকু বুকের দুধ সরবরাহ করতে পারেন এবং শিশুর বয়স ও ওজন অনুপাতে কতটুকু দুধ প্রয়োজন তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

শিশুর বয়স (মাস)	শিশুর ওজন (কেজি)	দৈনিক দুধ সরবরাহের পরিমাণ (মিলি)	শক্তি (কিলোক্যালরি)		আমিষ (গ্রাম)	
			দুধ থেকে সরবরাহ	দৈনিক প্রয়োজন	দুধ থেকে সরবরাহ	দৈনিক প্রয়োজন
০-১	৩.৮	৭১৯	৫০৩	৪৭০	৯.৩৫	৮.৯৩
১-২	৪.৭৫	৭৯৫	৫৫৬	৫৫০	৯.১৫	১০.৭
২-৩	৫.৬	৮৪৮	৫৯৪	৬১০	৯.৭৫	১০.১
৩-৪	৬.৩৫	৮২২	৫৭৫	৬৫৫	৯.৪৫	৯.৩৩
৪-৫	৬.৯	৮৫০	৫৯১	৬৮০	৯.৬	৮.৫
৫-৬	৭.৯	৬০০	৪২০	৭৯০	৬.৬	৯.৫

এখানে উল্লেখ্য যে, শিশুর বয়স যখন ৩-৬ মাস, তখন মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ দৈনিক গড়ে ৮৫০ মিলি থাকে। ৬-১২ মাস বয়স পর্যন্ত তা ক্রমশ কমে দৈনিক ৬০০ মিলি হয়। এরপর শিশুর ১২-১৪ মাস বয়স পর্যন্ত সময়ে মায়ের দুধ আরো কমে দৈনিক ৫৫০ মিলি হয়। শিশুর বয়স বাড়ার সাথেসাথে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মায়ের দুধের পরিমাণও কমে যেতে থাকে। তাই, শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে তার খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করতে মায়ের দুধের পাশাপাশি তাকে কিছু সম্পূরক খাদ্য দিতে হয়। শিশুর সম্পূরক খাদ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিচে আলোচিত হলো:

- ৬ মাস বয়সে শিশুর পাকস্থলির এককালীন ধারণক্ষমতা মাত্র ২০০ মিলি। কিন্তু এই পরিমাণ তার চাহিদার তুলনায় কম। তাই, শিশুকে একবারে বেশি খাবার খাওয়াতে চেষ্টা না-করে পর্যায়ক্রমে তার চাহিদা অনুযায়ী খাওয়াতে হবে এবং কম খাবারে কীভাবে বেশি এনার্জি বা শক্তি পাওয়া যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য শিশুদের খাদ্যে তেলের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদানের মধ্যে একমাত্র তেল থেকেই প্রতিগ্রামে ৯ কিলোক্যালরি এনার্জি পাওয়া যায়। অপরদিকে, প্রতিগ্রাম শর্করা ও প্রতিগ্রাম আমিষজাতীয় খাদ্য থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৪ কিলোক্যালরি। অতএব, শিশুর খাবারে একটু তেল দিলে খাবারটি যেমন বেশি শক্তিদায়ক হবে, তেমনি খাবার সুস্বাদু হবে এবং পরিমাণেও বেশি লাগবে না।
- আমিষের ঘাটতি পূরণ করার জন্য শিশুকে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকারের খাবার দেওয়া প্রয়োজন। তবে প্রাণীজ আমিষ শিশুর বর্ধনের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়, যেমন ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, মগজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য। উদ্ভিজ্জ আমিষের উৎস হচ্ছে সবধরনের ডাল এবং বীজজাতীয় খাদ্য যেমন মটরশুটি, বরবটি, শিম, বাদাম, ইত্যাদি।
- রঙিন শাক-সব্জি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল শিশুদের ভিটামিন এ-র ঘাটতি পূরণ করে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কাজেই, ভিটামিন এ-র চাহিদা পূরণ করতে এবং শিশুর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তার দৈনন্দিন খাবারে পরিমাণমত শাক-সব্জি ও ফল রাখা দরকার। ছোট মাছও ভিটামিন এ-র ভালো উৎস। তাই, শিশুকে ছোট মাছও দেওয়া যেতে পারে।
- আমাদের দেশে শিশুদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার অনেক বেশি। ২০০৪ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৬-১১ মাসের প্রায় ৯২% শিশু রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তাই, শিশুর খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করার সময় লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন কলিজা, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক-সব্জি প্রভৃতি যেন বাদ না-পড়ে তা খেয়াল রাখতে হবে।

এছাড়াও, শিশুদেরকে সম্পূরক খাবার খাওয়ানোর সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যেমন:

- অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।
- অল্প করে বারবার খাওয়াতে হবে।
- শিশু যা পছন্দ করে তা খেতে দিতে হবে। তবে, লক্ষ রাখতে হবে তা যেন পুষ্টিকর হয়। শিশু কোনো খাবার পছন্দ না-করলে তাকে জোর করে খাওয়ানো যাবে না, অন্য খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে।
- শিশুকে বিভিন্ন ধরনের খাবার দিলে তাতে পুষ্টিমান ভালো হয় এবং স্বাদেও বৈচিত্র্য বজায় থাকে।
- অসুস্থ শিশুর ক্ষেত্রে অসুখ সেরে যাওয়ার পর একটু বাড়তি খাবার দিলে তা শিশুর রোগজনিত ঘাটতি পূরণে সহায়ক হয়।
- খেয়াল রাখতে হবে যেন খাবার স্বাস্থ্যসম্মত, টাটকা এবং আবহাওয়ার উপযোগী হয়।

কী খাবার দিবেন

প্রথম যেদিন আপনার শিশুকে বাড়তি খাবার দিবেন পরিবারের জন্য রান্না-করা দু'মুঠো গরম ভাত চটকে নরম করে তাতে সামান্য একটু মাছ, এক চা চামচ সয়াবিন তেল এবং রান্না-করা ডালের ঘন অংশ নিয়ে মেখে খেতে দিন। খাওয়ার ফাঁকেফাঁকে একটু-একটু পানি খেতে দিন। লক্ষ রাখবেন যেন প্রথম বাড়তি খাবার খাওয়ার পর্বটি শিশুর জন্য আনন্দের হয়। সে একবার খেতে না-চাইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করুন। শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে মাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। মাকে বুঝে নিতে হবে শিশু টক, ঝাল, মিষ্টি বা কোন ধরনের খাবার পছন্দ করে। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কি না তা জানার জন্য সম্ভব হলে প্রতিমাসে একবার শিশুর ওজন নিতে পারেন।

সাধারণ দু'টি পুষ্টিকর সম্পূরক খাবারের নমুনা সারণিতে দেওয়া হলো:

সুজি	
ডিম	১টি
চালের গুঁড়া	৩০ গ্রাম (২ টেবিল চামচ)
চিনি	১৫ গ্রাম (১ টেবিল চামচ)
তেল	১৫ মিলি (১ টেবিল চামচ)
পানি	৪৫০ গ্রাম
রান্নার পর ৪০০ গ্রাম হবে এবং প্রতি ১০০ গ্রামে ১০০ কিলোক্যালরি এনার্জি পাওয়া যাবে	

খিচুড়ি	
চাল	২ মুঠো
ডাল	১ মুঠো
তেল	৫ চা চামচ
ডিম	১টি
আলু	১টি
পেঁয়াজ	১টি
মসলা	পরিমাণমত
প্রতি ১০০ গ্রামে ১০০ কিলোক্যালরি এনার্জি পাওয়া যাবে	

অনেকে শিশুকে সেরেলাক-এর মতো টিনজাত খাদ্য, জুস, চিপস প্রভৃতি দিয়ে থাকে। আমরা প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের পরিবর্তে শিশুকে চালের গুঁড়া, তেল, চিনি, ডিম দ্বারা প্রস্তুতকৃত টাটকা খাবার দিতে পারি। প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের রসের বদলে টাটকা ফলের রস দিয়ে শিশুকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। এতে পরিবারের খরচও কমে এবং শিশুর পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হয়।

নমুনাস্বরূপ একবছর বয়সের শিশুর একটি খাদ্যতালিকা নিচে দেওয়া হলো

মনে করি শিশুর ওজন=১০ কেজি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তি=১,০০০ কিলোক্যালরি। খাবারের ধরন, পরিমাণ ও প্রাপ্ত পুষ্টি-উপাদানসমূহ নিচের ছকে দেখানো হলো:

খাবার	পরিমাণ	আমিষ (গ্রাম)	কিলো-ক্যালরি
মায়ের দুধ (দৈনিক ১০/১২ বার খাবে)	৫৫০ মিলি	৫.৫	৩৮০
রুটি/পাউরুটি	১টি/১ টুকরা	১.০	৭০
ভাজা ডিম	অর্ধেক	৩.৫	৫০
ভাত	১ কাপ	১.০০	১২০
মাছ/মাংস	২ টুকরা	৪.০০	৮০
সব্জি	অর্ধেক কাপ	০.৫	৩০
ডাল (ঘন)	অর্ধেক কাপ	১.০০	৬০
খিচুড়ি/পরিজ/ হালুয়া	অর্ধেক কাপ	১.৫০	১০০
মুড়ির মোয়া/ পিঠা	২টি	১.৫০	১০০
মৌসুমী ফল	-	০.৫	৩০
মোট আমিষ ও ক্যালরি		২০.০০	১,০২০

শিশুকে কোন বেলায় কী দেওয়া যেতে পারে নিচের ছকে সেসম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হলো:

সকালের নাস্তা	
পাউরুটি বা আটার রুটি	১টি
ডিম-ভাজা	অর্ধেক
দিনের মধ্যবর্তী সময়ের দিকের খাবার	
সুজির হালুয়া	আধা কাপ
মৌসুমী ফল	পরিমাণমত
দুপুরের খাবার	
ভাত	আধা কাপ
মাছ/মাংস	১ টুকরা
সব্জি	পরিমাণমত
ডাল	পরিমাণমত
বিকেলের খাবার	
মুড়ির মোয়া/পিঠা	ছোট ২টি
মৌসুমী ফল	পরিমাণমত
রাতের খাবার	
দুপুরের মতো	

এখানে উল্লেখ্য যে, একবছর থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যতালিকা একই থাকবে। তবে, বয়স বাড়ার সাথেসাথে তার খাবারের পরিমাণও বাড়বে। শিশুর খাদ্যে দুধের একমাত্র উৎস হবে বুকের দুধ। শিশু দু'বছর বয়স পর্যন্ত বা যতদিন বুকের দুধ খাবে ততদিন তার জন্য বাইরের কোনো দুধের প্রয়োজন নেই। দুই/তিন বছর বয়সে শিশুকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো সব খাবারে অভ্যস্ত করুন। সে পরিবারের সবার সাথে বসে সবধরনের খাবার খাবে। ■

প্রত্যেক রক্তদাতা একজন বীর

ডাঃ কাজী নওশাদ হোসেন, আইসিডিডিআর,বি

আমরা জানি সারাবিশ্ব ১৪ জুন 'বিশ্ব রক্তদাতা দিবস' পালন করে থাকে। এই দিবসটির মূল ব্রত হলো মানুষের মূল্যবান জীবন বাঁচানোর জন্য নিরাপদ রক্ত ও রক্তের উপাদান সংগ্রহ করা, উপযুক্তভাবে রক্তের ব্যবহার বহুগুণে বাড়ানো এবং এর পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদেরকে তাঁদের এই মহতী কাজের জন্য সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যতে রক্তদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। প্রতিবারের মতো এবারও যথাযথ গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মনোনীত এবারের স্লোগান ছিলো 'Every blood donor is a hero' অর্থাৎ 'প্রত্যেক রক্তদাতা একজন বীর'। এবারও এই দিবসটিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমের মহান ব্রতকে

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের লোগো

সামনে রেখে এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন রক্তদান কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদেরকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেছে।

বর্তমান সময়ের প্রচলিত আরেকটি স্লোগান 'New blood for the world' অর্থাৎ 'পৃথিবীর জন্য নতুন রক্ত' থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এতে সমাজের শক্তিমান যুবসমাজকে স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে, যখন জনসাধারণ স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত হবে তখন অতি সহজেই এই আন্দোলন সার্থক হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, কোনো কোনো দেশে ১,০০০ জন মানুষের মধ্যে মাত্র একজন রক্ত দান করেন এবং পৃথিবীর ৮০টি

দেশ সবচেয়ে কম রক্তদাতাদের দেশের তালিকায় রয়েছে—এর মধ্যে ৭৮টি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ।

আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৪০টি দেশ পারিবারিক রক্তদানের ওপর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অর্থের বিনিময়ে রক্তদাতাদের' ওপর নির্ভর করে। এসব ক্ষেত্রে ২৫%-এর কম রক্ত সংগৃহীত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের কাছ থেকে। পৃথিবীর ৬২টি দেশ সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের ওপর নির্ভর করে থাকে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশেই তাদের প্রয়োজনীয় ১০০% রক্ত স্বেচ্ছায় দানকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

পৃথিবীতে প্রতিবছর ৯ কোটি ২০ লক্ষ বার রক্তদান করা হয়ে থাকে, যার সিংহভাগ হচ্ছে স্বেচ্ছায় রক্তদান। রক্তদানকারীদের মধ্যে ৩ কোটির মতো রক্তদাতা সারাজীবনে মাত্র একবার রক্ত দান করেন। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতি ছয়মাস পরপর রক্ত দান করে থাকেন এবং যাদের বয়স ৪৩ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে তাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও দেখা গেছে, আমাদের শরীরে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন তৈরি হওয়ার কারণে রক্তে আয়রনের আধিক্য ঘটে থাকে। নিয়মিত রক্তদানের মাধ্যমে আমাদের শরীরের মাত্রাতিরিক্ত আয়রনের পরিমাণ কমানো সম্ভব।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিরাপদ রক্তের গুরুত্ব অপরিসীম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেমন গর্ভবতী মায়েদের জটিল অপারেশনে, রক্তাল্পতায় আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায়, দুর্ঘটনাজনিত রক্তক্ষরণের ঘাটতি পূরণে, ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া ও হিমোফিলিয়া রোগীদের চিকিৎসায় এবং হার্ট সার্জারিসহ বড় ধরনের যেকোনো অস্ত্রোপচারে রক্তের প্রয়োজন হয়। সফল ও নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে প্রতিবছর অগণিত মানুষের জীবন রক্ষা পায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশনা দিয়ে থাকে যেন প্রত্যেকটি রক্তের ব্যাগ সতর্কতার সাথে ও নিয়মমাফিক স্ক্রিনিং করা হয়। দেশের বিদ্যমান হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ব্লাড ব্যাংকগুলোর উচিত রক্তের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ও নিরাপদ রক্ত বা রক্তের উপাদানগুলোর সার্থক ব্যবহারের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলো বিশ্ব রক্তদান দিবসের উল্লেখিত স্লোগানের মাধ্যমে প্রত্যেক রক্তদাতাকে একজন বীর হিসেবে অভিহিত করে সমাজের সক্ষম প্রতিটি নাগরিককে স্বেচ্ছায় রক্তদানে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেছে। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন 'বীর'-এ পরিণত হতে পারি। এই প্রক্রিয়া সামাজিক বন্ধন সৃষ্টিতেও এক বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা সারাজীবনে অসংখ্যবার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং এটিকে একটি অভ্যাসে পরিণত করেছেন। ফলশ্রুতিতে বেঁচে গেছে অনেক অমূল্য জীবন। আসুন, আমরা সবাই নিয়মিতভাবে রক্ত দিই এবং সমাজের জানা-অজানা সম্মানিত স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদেরকে উপযুক্তভাবে সম্মানিত করি, এর পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে চেষ্টা করি, যার সুফল সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ভোগ করতে পারবে এবং বহু অমূল্য জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে। ■

স্বাস্থ্য সংলাপের গত সংখ্যায় 'গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা'-শীর্ষক লেখাটিতে দেশব্যাপী যেসব স্থানে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। নিচের ছকে উক্ত তালিকাটি সংশোধিতরূপে পুনর্মুদ্রিত হলো:

সরকারি	বেসরকারি	এনজিও
ওয়ার্ড পর্যায়ে		
▪ কমিউনিটি ক্লিনিক ▪ স্যাটেলাইট ক্লিনিক	- -	- -
ইউনিয়ন পর্যায়ে		
▪ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (৩,৮২৭টি) ▪ মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) (২৪টি)	- -	- -
উপজেলা পর্যায়ে		
▪ উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প ▪ মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) (১২টি)	▪ বেসরকারি ক্লিনিক ▪ প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	- -
জেলা পর্যায়ে		
▪ জেলা সদর হাসপাতাল ▪ মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC)	▪ বেসরকারি ক্লিনিক ▪ প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	- -
সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে		
▪ আরবান ডিসপেন্সারি ঢাকা শহরে ▪ আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ▪ মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস ও ট্রেনিং সেন্টার ▪ মাতুয়াইল মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র	▪ বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল ▪ প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	অরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রকল্পের অধীনে ▪ এনজিও ক্লিনিক ▪ স্যাটেলাইট ক্লিনিক
জাতীয় পর্যায়ে		
▪ সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (১৪টি)	▪ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (৫৬টি)	▪ এনজিও হাসপাতাল

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান

যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।